খালিশপুরের সাম্প্রতিক পাটকল শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা

রুহুল আমিন

...এইভাবে চলতে চলতে হঠাৎ একদিন সকালে না খেয়ে কাজ করতে আসা একজন শ্রমিক মিলের ভেতরে তার কার্যস্থলেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। বারুদের মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এ খবর। খবর শুনে মিলের শ্রমিকরা সবাই কাজ রেখে বাইরে চলে আসে। বেতন না দেয়া পর্যন্ত তারা আর মেশিনে হাত দেবে না বলে জানিয়ে দেয়। পরের শিফটের শ্রমিকরাও মিল গেটে এসে ফিরে যায়, ভেতরে ঢোকে না।...

খালিশপুর জুটমিলের সিবিএ নির্বাচনে ১৬০ ভোটে হেরে যাওয়া দেলোয়ার ভাইয়ের বর্ণিত কয়েকটা ঘটনা দিয়েই শুরু করা যাক–

ঘটনা ১: "বেশি রাত না, নয়টা হবে, বিড়ি খেতে রাস্তায় গেছি...হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে দেখি একটা গেটের কোণায় এক মহিলাকে ঘিরে ৫/৭টা যুবক ছেলেপেলের জটলা...আমি আবার হাঁকডাক দিয়ে উঠলে লোকজন একটু শোনেটোনে...

তো, এ কিডা...কারা...কী হইছে...যা যা ভাগ...এই সব করে ছেলেপেলে সরিয়ে দিয়েছি...

তার পরই দেখি মহিলার মুখ শুকায়টুকায় বেজার...বুঝলাম আমার উপর অই অখুশি হয়েছে...

আমি এগিয়ে আসলাম তাকে বাঁচাতে...আর তার বদলে এই অবস্থা দেখে মেজাজ খারাপ হল...মহিলা যে বদ মহিলা তা বুঝতে কি আর দেরি থাকে?

তারপর হাঁটা শুরু করল, কথাবার্তা খুব একটা হয়নি...আমিও কী করে দেখার জন্য পিছনে পিছনে হাঁটতেছি...দূরেত্বে দূরেত্বে...খানিক বাদে দেখি এক ঘরের ভিতর ঢুকল...ঢুকলে পরেই...৭/৮ বছরের দুটো বাচ্চা দৌড় দিয়ে এসে বলল, 'মা, ভাত আনিছো'...মহিলা বসে পড়ে বাচ্চা দুটোকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে বলল, 'না, কিছু আনতি পারিনি'...

আমি যে কী করব বুঝতেছিলাম না...মাথায় ধরতেছিল না...

এরপর যতবারই এই ঘটনা মনে পড়েছে...আমি মরে যাই...হাত তুলে আল্লাহর কাছে শুধু বলি, আল্লাহ দেহো, ব্যবসা করে হলেও একটা মা দুইটে বাচ্চার ভাত জোগাড় করছিল...দুইটে মাসুম বাচ্চার মুখের আহার আমি কেড়ে নিয়েছি...আমাকে মাফ করে দ্যাও...

(একটু থেমে তিনিই নিজের খেয়ালে বললেন) মহিলাকে রাস্তায় গেলেই পাওয়া যাবে, তবে আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিব না...ওর বড় ক্ষতি হবে...সমাজে থাকবে কী করে?

পেটের দায়...মহিলার স্বামী মিলের শ্রমিক, বিল বেতন বন্ধ ছিল...কুলায় না পেরেই তো এই করতে আসছিল...আর কী-ই বা...

ঘটনা ২ : "বেশ রাত হয়েছে, দেড়টাটেড়টা বাজবে...হঠাৎ দেখি মিলের এক বদলি (অস্থায়ী) মহিলা শ্রমিককে নিয়ে দারোয়ান আর পুলিশের একরকম টানাটানি...তো আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম–কী হলো...কী হইছে...

পুলিশ জানাল–"এ বদ মায়েছেলে, নিয়ে যাব..."

তো, আমিও জোর দিয়ে জানালাম–"না, ওরে তো নিয়া যাবে না...কারণ কী বলতে হবে..."

হ্যানত্যান চলছে...পুলিশের হাতের থেকে নিয়ে দারোয়ানের কাছে দিয়ে বললাম, ওর বাপরে ডেকে নিয়ে আসব, তারপর সব...তোমার কাছে থাকবে।

খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি, বাপ হল প্যারালাইজড...

তারপর কথা বলতে গেলে কেঁদে দিয়ে মেয়ে বলে, "বাপ অসুস্থ, ওষুধ দিতি না পারি, খাওয়ায়ে বাঁচাতি তো হবে, নিজেরই তো খাবার নেই...বিল বন্ধ...কী করব..."

তখন মিলের বিল বেতন বন্ধ ছিল...

ঘটনা ৩ : স্বাস্থ্যসেবার পাওনা অধিকারের কথা বলতে গিয়েছিলাম, আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "আমাগে বিজেএমসির এট্টা হিসাব আছে, একেক মিলে কমবেশি হয়...এই এক কর (হাতের আঙুলের এক কর দেখিয়ে) কাইটে পড়ে গেলি সাড়ে তিন পার্সেন্ট...এক পার্সেন্টে তিন-সাড়ে তিন শ টাকা ছিল...এখন বাড়িছে, মনে হয় সাড়ে পাঁচ শর মত...

মানে এক কর পড়ে গেলি সাড়ে ষোলো শ টাকা ক্ষতিপূরণ আর দুই সপ্তার বেতনসহ ছুটি।

তা ধরেন কয়দিন আগে হল কি, আমাগে এক শ্রমিকের এরম আঙুল কাটা পড়ল। তা কিডা কারে দেহে...ম্যানেজমেন্ট, সিবিএ নেতা, সরদার–কারোর হুঁশ নেই...দেড় ঘণ্টা অই অবস্থায় আঙুল ধইরেটইরে বসে থাকল...তারপর মিলের গাড়ি আইসে নিয়ে গেল...অই পর্যন্ত...

একটা টাহাও পালো না...আমরা বদলি শ্রমিক যে...

তারপর যে কয়দিন আসতি পারল না তার বিল বাদ পড়ল...

খাতি গেলি (খেতে হলে) ওই আঙুল নিয়ে আইসে কাজ কইরে তারপর বেতন।

এগুলো হল খুলনা খালিশপুর শ্রমিক এলাকার নিতান্তই আড়ালে পড়ে থাকা খবর, যার খোঁজ কেউ রাখে না, পত্রিকার ১৪ নং পৃষ্ঠার ৮ নং কলামেও যার স্থান হয় না। মধ্য আয়ের দেশে এ সংবাদ কেনই বা শিরোনাম হতে যাবে? যেখানে উন্নয়নই শেষ কথা, সেখানে তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার মত সংবাদ ছাপানোই বা হবে কেন?

তবু পাটকল শ্রমিকদের আন্দোলন সংবাদের শিরোনাম হয়, টিভিতে টকশো চলে গভীর রাত পর্যন্ত। লাইট-ক্যামেরার সামনে সরকার-শ্রমিক-ব্যবস্থাপনার দোষ-গুণ নিয়ে আলোচনা চলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বিজ্ঞজনরা কল্যাণমূলক বিভিন্ন পরামর্শও দেন। কিন্তু দিন শেষে যা ছিল তা-ই। অন্ধকারই হয়ে ওঠে বেঁচে থাকার আশ্রয়, কোন পরিবর্তন হয় না সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার।

খুলনা খালিশপুর ক্রিসেন্ট জুটমিলের আয়তন ১১৩.৩ একর (খুলনায় অবস্থিত দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়তনের চেয়েও বেশি)। দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ পাটকল এটি। ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত এই মিলে কী নেই– প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খেলার বিশাল মাঠ, শ্রমিক-কর্মচারী-অফিসারদের জন্য একাধিক ক্লাব, ফুটবল-ক্রিকেটসহ নানামাত্রিক খেলার সরঞ্জাম ইতাদি। শিশুদের জন্য ছিল পার্ক, শ্রমিকদের উদ্যোগে বের হত বার্ষিক ম্যাগাজিন, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাসহ নাটক ও যাত্রার দল ছিল, যারা বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে

অনুষ্ঠান করত। বরাদ্দ থাকত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্য, যেগুলো আজ ইতিহাস।

সব আয়োজন নিয়ে গড়ে ওঠা এই পাটকলে প্রতিদিন ১২০-১৩০ টন পাটপণ্য উৎপাদিত হত। আজও এর উৎপাদন সক্ষমতা আছে ৯০ টনের মত, কিন্তু কাঁচামালের অভাবে দিনশেষে উৎপাদন হয় ৩০ টন। প্রায় শতভাগ আবাসিক এই পাটকলে একসময় যেখানে চাকরি করত ১০-১২ হাজার শ্রমিক, আজ সেখানে আছে মাত্র ৬ হাজার জন, যার অর্ধেকেরও বেশি অস্থায়ী। তিন শিফটের জায়গায় কাজ চলে দুই শিফটে। নিয়মিত মজুরি না পাওয়ার কারণে অনেকে আবার চাকরির পাশাপাশি অন্য কিছু করার চেষ্টা করেন। আর তা না হলে সংসার-পরিজন নিয়ে বেঁচে থাকা দায়। ক্রিসেন্ট জুটমিলের কবির ভাই স্থায়ী শ্রমিক হওয়া সত্ত্বেও কাজের ফাঁকে ফাঁকে ইজিবাইক চালান। খালিশপুর জুটমিলের দেলোয়ার ভাই (৫৫) একসময় পরিবার নিয়ে কলোনিতে থাকলেও আজ তিনি স্ত্রী-সন্তানদের গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে মেসে একটি সিট নিয়ে থাকেন। এই বয়সেও তাঁকে নিজে রান্না করে খেতে হয়।

পাটকলের এই পরিস্থিতি দেখে যে কারও মনেই হবে–এটা অবহেলা নয়, হত্যাকাণ্ড। পরিকল্পনা করে রাষ্ট্রায়ত্ত এই পাটশিল্পকে ধ্বংস করা হচ্ছে। কিন্তু বিশালাকৃতির কারণে এর মরতে একটু সময় বেশি লাগছে। আর মরতে দেয়া গেলে মেরে ফেলার দায় তো নিতে হবে না! বরং চিকিৎসার নামে জনগণের টাকা পকেটস্থ করার ও সেবা করার স্বীকৃতি দুটোই পাওয়া যাবে। কী এক অদ্ভুত আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্র, সরকারের মন্ত্রী-আমলা-এমপিরা! একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কি এমনই হয়?

দ্রুত মধ্য আয়ের দেশের স্বীকৃতি এবং সেখান থেকে একলাফে উন্নত দেশে পৌঁছানোর জন্য সারা বাংলাদেশে ১০০টি ইকোনমিক জোন করার ঘোষণা দিয়েছে সরকার। বাস্তবায়নের উদ্যোগও চলছে ব্যাপক গতিতে। হাজার হাজার মানুষকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে, কৃষিজমি ধ্বংস করে উন্নয়নের এ উৎসবযজ্ঞ চলছে। অথচ সমস্ত আয়োজন নিয়ে গড়ে ওঠা জুটমিলগুলো আজ মৃতপ্রায়।

সারা বিশ্বে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা যখন ব্যাপক হারে বাড়ছে, তখন আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরাও তার সাথে পালা দিয়ে এগিয়ে চলেছে। দিন দিন বেসরকারি পাটকলের সংখ্যা বাড়ছে। আশির দশকে গজিয়ে ওঠা বেসরকারি পাটকলের সংখ্যা আজ ১৭০টি। আকিজ গ্রুপ তামাকের ব্যবসা জাপানিদের কাছে বিক্রি করে দিয়ে আজ যখন পাটশিল্পের দিকে ঝুঁকছে, তখন সোনালি আঁশের দেশ নামে খ্যাত আমাদের দেশের সরকারি পাটকলগুলোতে বছরের পর বছর লোকসান দেখিয়ে বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে কিংবা পিপিপির নামে বেসরকারি মালিকের হাতে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় সরকারি পাটকলের সংখ্যা যেখানে ছিল ৭৭টি, আজ সেখানে ২৫টিতে এসে দাঁড়িয়েছে।

গত কয়েক বছর ধরে ঈদ, নির্বাচন, বিশেষ দিন উপলক্ষেই শ্রমিকদের বেতন-ভাতা দেয়া যেন রেওয়াজ হয়ে গেছে। পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে করে একটানা কাজ করতে হয় কয়েক মাস, তারপর সেই কাজের বেতনের দাবিতে (বাড়ানোর নয়, পাওনা) আন্দোলন করতে রাজপথে থাকতে হয় পাঁচ-সাত দিন থেকে এক মাস পর্যন্ত। মজার ব্যাপার হল, এই শ্রমের তারা কোন মজুরি পায় না।

সর্বশেষ এ বছর জাতীয় নির্বাচনের পর থেকে পাটকল শ্রমিকরা বেতন না পেয়ে আন্দোলনে নামে বেশ কয়েকবার। এবার আর কেবল বেতন নয়, মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন, শূন্য পদে বদলি শ্রমিক স্থায়ীকরণ, পাটের মৌসুমে সময়মত অর্থ বরাদ্দ ও পাটক্রয়, বিএমআর করা অর্থাৎ আধুনিক যন্ত্রাংশ ক্রয় করা, চাকরিচ্যুত বা অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের শ্রম আইন অনুযায়ী এককালীন অবসর ভাতা প্রদান করাসহ ৯ দফা দাবিতে আন্দোলনে নামে তারা। মার্চ-এপ্রিল মাসে দুই দফা আন্দোলনের ফলে সরকার তাদের বকেয়া বেতন ও মজুরি কমিশন বাস্তবায়নের ঘোষণা দেয়।

শ্রমিকরা নেতাদের কথা অনুযায়ী আন্দোলন স্থগিত রেখে কাজে যোগদান করে বটে, কিন্তু সময় (২৫ তারিখ) চলে গেলেও বকেয়া মজুরি ও মজুরি কমিশন বাস্তবায়নের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। নেতারাও কোন কথা বলে না। ২৫টি জুটমিলের ৬৪ হাজার শ্রমিকের অবস্থা দিন দিন আরও খারাপ হতে থাকে। পেটে ক্ষুধা ও বুকে যন্ত্রণা নিয়ে কাজে যায়। প্রতিদিন সকালে একটা বড় অংশের শ্রমিক না খেয়ে এক গ্লাস পানি খেয়েই মিলে যায়।

এই পাটকলে প্রতিদিন ১২০-১৩০ টন পাটপণ্য উৎপাদিত হত। আজও এর উৎপাদন সক্ষমতা আছে ৯০ টনের মত, কিন্তু কাঁচামালের অভাবে দিনশেষে উৎপাদন হয় ৩০ টন। প্রায় শতভাগ আবাসিক এই পাটকলে একসময় যেখানে চাকরি করত ১০-১২ হাজার শ্রমিক, আজ সেখানে আছে মাত্র ৬ হাজার জন, যার অর্ধেকেরও বেশি অস্থায়ী। তিন শিফটের জায়গায় কাজ চলে দুই শিফটে।

এইভাবে চলতে চলতে হঠাৎ একদিন সকালে না খেয়ে কাজ করতে আসা একজন শ্রমিক মিলের ভেতরে তার কার্যস্থলেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। বারুদের মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এ খবর। খবর শুনে মিলের শ্রমিকরা সবাই কাজ রেখে বাইরে চলে আসে। বেতন না দেয়া পর্যন্ত তারা আর মেশিনে হাত দেবে না বলে জানিয়ে দেয়। পরের শিফটের শ্রমিকরাও মিল গেটে এসে ফিরে যায়, ভেতরে ঢোকে না।

ওইদিন সন্ধ্যায় ক্রিসেন্টের শ্রমিকরাও বিদ্রোহ করে কাজ বন্ধ করে দেয়। ৬ তারিখ সকাল থেকে খুলনা অঞ্চলের ৯টি মিল একযোগে ধর্মঘটের ডাক দিয়ে রাজপথ-রেলপথ অবরোধ করার ঘোষণা দেয়। বকেয়া বেতন প্রদান ও মজুরি কমিশন বাস্তবায়নসহ ৯ দফার এ আন্দোলন ছিল শ্রমিকদের অস্তিত্ব রক্ষার চূড়ান্ত কর্মসূচি।

প্রতিদিন বিকাল ৪টার মধ্যে প্রতিটি মিলের শ্রমিক নেতারা আলাদা আলাদা মিছিল নিয়ে খালিশপুরের নতুন রাস্তা মোড়ে হাজির হয়ে ৪টা থেকে ৭টা পর্যন্ত রাজপথ-রেলপথ অবরোধ করে কর্মসূচি পালন করে। পাশাপাশি অবস্থান করা ৫টি মিলের কয়েক হাজার শ্রমিক এ সময় ৪টি রাস্তা ও রেলপথ বন্ধ করে দিয়ে রাস্তায়ই নামাজ আদায় ও সমাবেশ করে এবং ওখানেই ইফতার করে আন্দোলনের কর্মসূচি সম্পন্ন করে।

আন্দোলনের প্রতিটি দিন ছিল শ্রমিকদের কাছে অনেক বেশি কঠিন, হতাশার ও যন্ত্রণাদায়ক। একদিকে আবহাওয়া ছিল অনেক বেশি উত্তপ্ত, সাথে ছিল রোজার মাস। আর তার সাথে নেতাদের আপোসমূলক কর্মসূচি প্রতিটি শ্রমিককে প্রচণ্ড মাত্রায় বিক্ষুব্ধ করে তোলে। মনে হত, প্রতিটি শ্রমিকের রাগ, ক্ষোভ, কষ্ট, যন্ত্রণা,

হতাশাকে যদি এক করে ফেলা সম্ভব হয় তাহলে মুহূর্তের মধ্যেই তাতে আগুন ধরে যাবে।

শ্রমিকরা চাইত টানা (সকাল-সন্ধ্যা) অবরোধ করে দাবি আদায় করতে, কিন্তু নেতারা সে পথে না হেঁটে বিকালের মধ্যেই কর্মসূচি সীমাবদ্ধ রাখত। কেননা তারা যে সরকারদলীয় রাজনীতির সাথে যুক্ত! তার পরও প্রায় ১৫ ঘণ্টা না খেয়ে থেকে আন্দোলনে অংশগ্রহণ ছাড়া শ্রমিকদের আর কোন বিকল্প ছিল না। এই রোদের মধ্যে বেশির ভাগ শ্রমিক পায়ে হেঁটে মিছিল করে সমাবেশস্থলে উপস্থিত হত। বয়স ও অতিরিক্ত পরিশ্রমের ভারে ক্লান্ত পঞ্চাশ-ষাটোর্ধ্ব একজন শ্রমিকের পক্ষে প্রতিদিন দুই থেকে তিন কিলোমিটার উত্তপ্ত পিচঢালা পথ স্লোগানের সাথে গলা মিলিয়ে পায়ে হেঁটে মিছিলে আসা অত সহজ কথা নয়। তার পরও তারা আসত।

ক্লান্ত শরীরে একা একা হাঁটতে না পারলেও অন্যের হাত ধরে মিছিলে আসার দৃশ্য বাংলাদেশের শোষিত মানুষের মনোবল, নৈতিক শক্তি ও দায়িত্বশীলতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আন্দোলন দেখতে আসা কিংবা মিছিলের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলে সরকারের সমালোচনা করে আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তোলা মানুষদের জন্য এই আন্দোলন ছিল সত্যি শিক্ষণীয়।

দিনশেষে ইফতারের সময় আন্দোলনরত শ্রমিকদের ভাগ্যে দুটি খেজুর ও চিড়াই জুটত বেশির ভাগ দিন। আন্দোলনের শেষের দিকে এর কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। এগিয়ে আসেন সমাজের কিছু সহানুভূতিশীল মানুষ।

বৈরী আবহাওয়া, রোজার ক্লান্তি, নেতাদের আন্দোলনবিমুখতা, রাজনৈতিক চাপ, প্রশাসনের হুমকি– সব কিছু উপেক্ষা করে প্রতিদিন কয়েক হাজার শ্রমিক রাজপথ-রেলপথ অবরোধ করে আন্দোলন চালিয়ে গেছে টানা ১৬ দিন। সরকারের বাইরে থাকা বামপন্থী দলগুলোর সাথে সাথে সাধারণ মানুষও এ আন্দোলনে বিভিন্নভাবে (লেখার মাধ্যমে, সহযোগিতা পাঠিয়ে) ভূমিকা রাখে।

দীর্ঘদিন ধরে চলা শ্রমিকদের এই ৯ দফা দাবি আদায়ের জন্য দেশের সর্বস্তরের মানুষকে যুক্ত করার লক্ষ্যে বাম ছাত্র সংগঠন ও বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্যোগে শ্রমিক-ছাত্র-জনতা ঐক্য নামক একটি প্ল্যাটফর্ম গড়ে ওঠে। তাদের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় এক সংহতি সমাবেশের। ফলে অন্য দিনের তুলনায় সেদিন দ্বিগুণেরও বেশি শ্রমিক সমাবেশে অংশগ্রহণ করে নতুন আশা নিয়ে। ছাত্র সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকের উপস্থিতি, বামপন্থী দলসমূহের ভূমিকা ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতি সমাবেশকে ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে।

পরিস্থিতি সামাল দিতে তাৎক্ষণিকভাবে সমাবেশে জেলা প্রশাসক এসে হাজির হয়ে ঘোষণা দিতে বাধ্য হন, "আর দুই-তিন দিনের মধ্যেই সব শ্রমিকের সকল বকেয়া পরিশোধ করে দেয়া হবে।" পাটকল শ্রমিকরা জেলা প্রশাসককে গালিগালাজ করতে থাকে। এরপর পরিস্থিতি সামাল দিতে পাটকল শ্রমিক আন্দোলনের খুলনা অঞ্চলের আহ্বায়ক শ্রমিক নেতা সোহরাব হোসেন মঞ্চে উঠে ঘোষণা দেন, "দু-এক দিনের মধ্যে দাবি আদায় না হলে আরও কঠোর কর্মসূচিতে যাওয়া হবে।"

খানিকটা একঘেয়ে হয়ে উঠা পরিস্থিতিতে শ্রমিকরা আবার আশাবাদী হয়। কিন্তু দু-এক দিনের মাথায় জেলা প্রশাসক শ্রমিক নেতাদের তাঁর কার্যালয়ে ডেকে নেন। শোনা যায়, একভাবে চাপ প্রয়োগ করে এবং কিছুটা দাবি আদায়ের আশ্বাস দিয়ে নেতাদেরকে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিতে বলেন।

ওইদিন (২১ এপ্রিল) সন্ধ্যায় প্রত্যেক মিলের নেতারা যখন গেট মিটিং করে জেলা প্রশাসকের আশ্বাসের কথা ঘোষণা করে তখন শ্রমিকরা রাগে গজগজ করতে থাকে। অনেকে রাগে-ক্ষোভে কান্না ধরে রাখতে পারে না। চোখে-মুখে হাত দিয়ে আড়ালে চলে যায়। চাকরি চলে যাওয়ার ভয় থাকলেও অনেকে নেতাদের সাথে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে। কেউ কেউ চিৎকার করে গালি দিতে থাকে নিজের ভাগ্যকে।

যে পাটকলে চাকরি করা ছিল একসময় গৌরবের বিষয়, সেই পাটকলেই চাকরি করে আজ শ্রমিকরা নিজেই নিজেকে গালি দিচ্ছে! ৪০ বছর মিলে চাকরি করে পেনশনের টাকা না পেয়ে আবার বদলি হিসেবে কাজ করছেন অনেক বয়স্ক শ্রমিক।

পরদিন থেকে শ্রমিকরা অসন্তুষ্টি নিয়ে আবার মিলে যাওয়া শুরু করে। সবাই প্রথমে না গেলেও দু-এক দিন পর ঠিকই মিলে গিয়ে হাজির হয়। কী আর করা? ২০-৩০ বছর একটানা মিলে চাকরি করে এই বয়সে আর কি কিছু করা সম্ভব? কেউ যে চেষ্টা করে না তা নয়। অনেকেই চেষ্টা করে, কিন্তু কী করবে?

> সারা বিশ্বে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা যখন ব্যাপক হারে বাড়ছে, তখন আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরাও তার সাথে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলেছে। আমাদের পাটমন্ত্রীও এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। তাঁর নিজেরই আছে বেশ কয়েকটি পাটকল।

ঈদের চার দিন আগে দুই ধাপে শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি পরিশোধ করে সরকার তথা বিজেএমসি। প্রধান দাবি মজুরি কমিশনসহ বাকি দাবিসমূহ থেকে যায় অনালোচিত। আর এর সাথে আবারও অনিশ্চয়তার পথ বেয়ে পথচলা শুরু হয় ২৫টি মিলের ৬৪ হাজার শ্রমিক পরিবারের।

ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত মাথাভারী, দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন, অদক্ষ কর্মকর্তা, অপরিকল্পিত সিদ্ধান্ত, সময়মত পাট না কিনে অন্য সময়ে দ্বিগুণ দামে পাট কেনা, মিলের যন্ত্রপাতির আধুনিকায়ন না করা, বিপণনের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাদের অদক্ষতা ও দুর্নীতিগ্রস্ততা এবং সিবিএ নেতাদের (প্রায় সবাই) আপোস, সুবিধা ও স্বেচ্ছাচারিতার দায় আজ চাপান হচ্ছে কর্মরত শ্রমিকদের ওপর। অথচ এর দায় কোনভাবেই সাধারণ শ্রমিকের নয়। আজ শত প্রতিকূলতার মধ্যেও পাটশিল্প যতটুকু টিকে আছে তার ভূমিকায় আছে এই সকল না খাওয়া শ্রমিক। কথা বলে জানা যায়, প্রতিটি মিলে এমন সব দক্ষ শ্রমিক আছে, যারা পুরো মিলের দায়িত্ব নিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থারই পরিবর্তন ঘটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু তারাও আজ নিরুপায় সমগ্র ব্যবস্থার কাছে। তাই ব্যবস্থার পরিবর্তন না ঘটলে সোনালি আঁশ কেবল অতীত গৌরবের বিষয় হিসেবেই ইতিহাসে থাকবে।

রুহুল আমিন: রাজনৈতিক কর্মী
ই-মেইল: ruhulssf@gmail.com